লিচুবাগানের চৌকিদার

হাতির শোক

বাবার সঙ্গে কাল তাইল্যান্ড যাচ্ছি ভেবে আনন্দে সারা রাত আমার ঘুমই হল না।

মাত্র পাঁচ মাস আগেই গিয়েছিলাম মায়ানমার, আগে যে দেশটার নাম ছিল বর্মা, লোকে নাকি বলত বর্মামুলুক। এবার চলেছি তাইল্যান্ড।

আসলে যেসব দেশে প্রচুর হাতি, সেসব দেশে প্রায়ই বাবার ডাক পড়ে। তার কারণ আমার বাবা হাতির খুব বড় ডাক্তার। আগে প্রায় সবরকম পশুপাখির চিকিৎসা করলেও বেশ কিছু কাল শুধুই হাতির চিকিৎসা করেন। বড় দুর্ঘটনায় পড়ে বা চোরাশিকারির হাতে সাংঘাতিক আহত হয়ে যে হাতির বাঁচবার আর আশাই থাকে না, আমার বাবা সেই হাতিকেও বাঁচিয়ে তুলতে পারেন। অনেক সময় অজানা অসুখে পালে পালে হাতি মরে যায়, তখন আমার বাবাই গিয়ে বাকিদের বাঁচান। এরকম একবার তো দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রুগের ন্যাশনাল পার্কে হাতির মারণরোগ ঠেকাতে সেদেশের সরকার আলাদা প্লেন পাঠিয়ে বাবাকে তাদের দেশে নিয়ে গিয়েছিল। সেবারও আমি সঙ্গে গিয়েছিলাম। সেই সুযোগে ক্রুগের ন্যাশনাল পার্কে খুব কাছ থেকে দলে দলে সিংহ, জেব্রা, জিরাফ দেখেছি। কত রকমের কত হরিণ যে দেখেছি তা কেউই বলতে পারবে কিনা সন্দেহ।

বাবা মনে হয় হাতির শরীরের কষ্টই শুধু নয়, মনের সব কথাও খুব গভীরভাবে বুঝতে পারেন।

আমার দুঃখও বাবা খুব বোঝেন। ছোটবেলা থেকেই আমার মা নেই বলে বাবা বাইরে যাবার সময় আমাকে কখনও বাড়িতে একা রেখে যান না।

কলকাতায় বাবার অনেক পশুচিকিৎসক-বন্ধু বাবাকে হাতির ধন্বন্তরি বলেন। বিদেশে আবার অনেকেই গড অব এলিফ্যান্ট বা হাতির ভগবান বলে উল্লেখ করেন। বাবা হয়তো আগের জন্মে হাতিই ছিলেন। না হলে অসহ্য কষ্টেও হাতি বাবাকে দেখামাত্র যন্ত্রণায় বুজে আসা ছোট্ট ছোট্ট চোখদুটো বাবার চোখ থেকে একবারের জন্যও সরায় না কেন! মায়ানমারে দলপতি হবার লড়াইয়ে হেরে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত একটা বুড়ো হাতিকে দেখেছি জঙ্গলের গভীরে একটা খাদের ধারে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে, বাবাকে দেখেই বাবার চোখ থেকে চোখ আর নামায় না। সেই হাতিকেও বাবা কয়েক দিনের চেষ্টায় বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

তাইল্যান্ডের যে রাজকর্মচারী বাবাকে নিয়ে যেতে এসেছিলেন, কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কক যাবার প্লেনে উঠে বাবা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হাতির পাল কতদিন ধরে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে? পালে হাতির সংখ্যাই বা কত?

ভদ্রলোকের পরনে সাফারি স্যুট। হাতের ব্যাগ থেকে প্লাস্টিকের একটা পাতলা

ফাইল বের করে তাতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার, স্যার, ষোলোটা হাতি তিনদিন ধরে নদীর পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। এই অমাবস্যার ঠিক আগের দিন থেকে।

বাবা মন দিয়ে কথাটা শুনে বললেন— এ তো প্রবল শোকের প্রকাশ! ঠিক কী ঘটেছে কিছু জানেন কি?

রাজকর্মচারী প্লেনের শব্দ এড়াতে বাবার কানের কাছে ঝুঁকে এসে বললেন— সেদিন উপজাতিদের একটা পরব ছিল। পরবের দিন ওই উপজাতির সব মানুষ কলাগাছের ভেলা বানিয়ে সেই ভেলার ওপর পাকা কলার কাঁদি চাপিয়ে পাহাড়ি নদীর স্রোতে সেগুলো তাদের হস্তিদেবতার উদ্দেশে ভাসিয়ে দেয়।

বনের হাতিরাও সেদিন কলার গন্ধে নদীর তীরবরাবর বেশ কয়েক মাইল জায়গায় জড়ো হয়। জলে নেমে কলা খায়। সেদিনও ওইরকম একপাল হাতি পাহাড়ি নদীর প্রবল স্রোতে নেমে গিয়ে শুঁড় দিয়ে কলার কাঁদি তুলে নিয়ে মুখে পুরছিল। এমন সময় পালের একটা বাচ্চা হাতি জলের তোড়ে ভেসে যায়। নদী তোলপাড় করেও তাকে আর ফিরে পাওয়া যায়নি। হাতির পাল সেই থেকেই ওখানে একভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

'তাইল্যান্ডের ঠিক কোথায় এটা ঘটেছে?'

'চিয়াংমাইয়ের জঙ্গলে।'

ভদ্রলোকের আরও কিছু বলার ছিল মনে হল। কিন্তু তার আগেই প্লেন ব্যাঙ্কক এয়ারপোর্টে নেমে পড়ল। সেখান থেকে প্রায় তখনই আমাদের আরেকটি বিমানে তুলে নেওয়া হল। ঘণ্টাখানেক পর এবার যেখানে নামলাম সেটা চিয়াংমাই বিমানবন্দর। সেখানে আরও দু'জন অফিসার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। খুব বড় আর সুন্দর একটা গাড়িতে চড়িয়ে আমাদের চিয়াংমাইয়ের জঙ্গলে ঢোকার মুখ অব্দি নিয়ে যেতে দুপুর হয়ে গেল।

চটপট দুটো হাতির পিঠে আমাদের চড়ানো হল। একটায় বাবা আর নতুন দু'জন রাজকর্মচারী। অন্যটায় যিনি আমাদের কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন তিনি আর আমি।

পুরো দু'ঘণ্টা ধরে জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে হঠাৎ নদীর প্রবল শব্দে আমি তো চমকেই উঠেছিলাম। বাপরে, নদীর এমন গর্জন!

বাবা আগেই হাতির পিঠ থেকে নেমে নদীর ধারে হাতির পালের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন। আমি অনেক কসরত করে মাটিতে পা দিয়ে দূরে হাতিদের স্থির মূর্তি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আরও নীচে নেমে গিয়ে দেখলাম বাবা প্রত্যেকের চোখে চোখ রেখে মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে কানের পিছনে আঙুল দিয়ে কী যেন করছেন।

ঠিক কী করছেন দেখতে গিয়ে যেই আরও ঝুঁকেছি, টাল সামলাতে না পেরে পাথুরে জমিতে ঠোক্কর খেতে খেতে সোজা নদীতে গিয়ে পড়লাম।

আশ্চর্যের কথা, আমি স্রোতে ভেসে গেলাম না। একবার মাত্র কনকনে ঠান্ডা জলে চুবুনি খেয়ে সোজা আকাশে উঠে গিয়ে, বুক ভরে হাওয়া নিয়ে বাঁচলাম। আমি জলে পড়ামাত্র একটা হাতি শুঁড়ে জড়িয়ে আমাকে উঁচুতে তুলে নেয়। তারপর শুঁড়ে

জড়িয়েই সে আমাকে আরেকটা হাতির শুঁড়ে চড়িয়ে দিল। এইভাবে এক হাতির শুঁড় থেকে আরেক হাতির শুঁড়ে, তারপর আরেকটা হাতির শুঁড়ে চড়ে চলতে লাগল আমার আকাশভ্রমণ বা আকাশে দোল খাওয়া। আমার ভয় তো করলই না, বরং মনে হল যেন স্বপ্নের মধ্যে নাগরদোলায় চড়েছি। কখনও ওপরে টকটকে নীল আকাশ, কখনও নীচে গর্জনরত নদীস্রোত, কখনও চারদিকে চকচকে ঘন সবুজ অরণ্য দেখতে দেখতে যতক্ষণ না বাবার পিঠের ওপর পড়ে ঘোড়া হয়ে বসলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত বাবা নাকি আমাকে দেখতেই পাননি। বাবা তখন একটা হাতির ওপর ঝুঁকে তার শুঁড়ের ডগায় নানাভাবে ফুঁ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

অন্যান্য হাতিরা দেখলাম দিব্যি শুঁড় দোলাচ্ছে। তাদের সেই পাথরের মতো স্তব্ধ ভাবটা আর নেই। ক্রমশ দলের সবাই বেশ সহজভাবে নদীতীর ছেড়ে উঠে আসতে লাগল।

দলের একটা বাচ্চা হাতিকে হারানোর ব্যথা এরা ভুলল কী করে? হাতির পালের সঙ্গে নদীতীর থেকে ফিরে আসতে আসতে বাবা আমার মনের প্রশ্নটা বোধহয় বুঝেছিলেন, বললেন, তোমাকে জলে ভেসে যেতে দেখে ওদের বাচ্চা হারানোর দুঃখ দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল। তোমাকে বাঁচাতে পেরে ওরা ওদের সন্তানকে বাঁচাতে না পারার ব্যর্থতা ভুলতে পেরেছে।

মুড়োহাসা গ্রামে

পূর্ণিমার দুয়েকদিন আগে থেকেই চাঁদ প্রথমে বসবে সবেদাগাছে। তারপর সাতটা না বাজতে সরে আসবে জলপাইগাছে। রাত আটটা ন'টার মধ্যে নারকেলেকুল গাছের মাথায়।

বারুইপুরে আমাদের বাড়ি থেকে দু'-পা এগোলেই বাঁদিকে এই একটা সবেদাগাছ আমি হাঁটতে শিখেই দেখেছি। সবেদাগাছটার পর আর দু'-চার পা গেলে বিরাট একটা জলপাইগাছ। প্রায় বটগাছের মতো বড়। প্রতি বছর ভালোমতো শীত পড়তে না পড়তে অঘ্রাণের গোড়া থেকেই রোজ ঘুম থেকে উঠে আমি জলপাইগাছের তলায় শিশিরভেজা শুকনো পাতার ভিড়েও বড় বড় জলপাই ঠিকই দেখতে পেতাম। শার্টের তিন পকেটে যত জলপাই ধরে ভরতি করে তবে ঘুমভাঙা চোখ-মুখে জল দিতাম।

পূর্ণিমার আগে থেকে কয়েক দিন পর পর্যন্ত, সন্ধে নামলেই, আমাদের বাড়ির সামনে মেটেপথের ওপর প্রথমে সবেদাগাছ, তারপর জলপাইগাছ সব শেষে নারকেলেকুল গাছের ছায়া আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ছায়াগুলো গাছের তলা ছাড়িয়ে খুব একটা লম্বা হত না।

আমার স্কুলের বন্ধু বিশুর বড় জ্যাঠামশাই তাঁর যাত্রাদলের মহড়া শেষ করে রোজ মাঝরাতে হাতে হ্যারিকেন ঝুলিয়ে আমাদের সেই রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরতেন। পূর্ণিমায় গাছের ছায়ার নড়াচড়া তেমন স্পষ্ট না হলেও অমাবস্যায় হ্যারিকেনের আলোর দুলুনিতে গাছের কালো ছায়াও ভীষণ দুলত। মানুষটা খুবই লম্বা, বিশু বলে সাত ফুট তো হবেই। অত লম্বা শরীর নিয়েও ঘাড় নিচু করে হ্যারিকেন দোলাতে

দোলাতে উত্তরমুখো রাস্তা ধরে চলে যেতেন।

এই জ্যাঠামশাইয়ের শ্বশুরবাড়ি সুন্দরবনের ‘মুড়োহাসা’ গ্রামে। জলজঙ্গলের মধ্যে কতগুলো মেটে বাড়ি আর একটা দোতলা বাড়ি, সেটাও গরাণপাতায় ছাওয়া এঁটেল মাটির, এই নিয়ে ছোট্ট এই গ্রাম। বিশুর মুখে এই গ্রামের অনেক গল্প শুনেছি। তাঁর জ্যাঠার সঙ্গে ছোটবেলা থেকে প্রতি বছর গ্রীষ্মের ছুটি, পুজোর ছুটিতে সে অনেক বার ‘মুড়োহাসা’ গ্রামে বেড়াতে গেছে।

আগে সে গ্রাম ছিল নাকি ডাকাতদের। গোটা গ্রামেই শুধু ডাকাতদের বাস। ডাকাতরা তাদের ঠাকুরদার ঠাকুরদার, তারও ঠাকুরদার সময় থেকে এই গ্রামে থাকত। এখান থেকে ছিপনৌকোয় তারা দূর দূর গ্রামে গিয়ে ডাকাতি করত। আশপাশের সব নদীতেও ডাকাতি করত। তখন জমিদার ও বণিকরা বড় বড় পাকা বাড়িতে বাস করত। ইংরেজ শাসকদের ও তাদের অনুগত জমিদারদের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাতায়াত করতে হত নদীপথে বড় বড় নৌকোয়। ধনীরা বাড়ির সবাই মিলে অন্য গ্রামে আত্মীয়-কুটুমদের বাড়ি বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন বা শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নে বজরা চড়ে যাতায়াত করতেন।

ডাকাতে-গ্রামের একটা নিয়ম ছিল, যে গ্রামে ডাকাতি করবে সেই গ্রামের পুকুর থেকে বড় বড় মাছ নৌকো ভরে নিয়ে আসবে। গ্রামে ফিরে অভ্যাসমতো তারা মাছের মুণ্ডুগুলো কেটে মাটিতে পুঁতে দেবে।

সেই ডাকাতরা আর নেই। একসময় তাদের লুটতরাজে তিতিবিরক্ত ইংরেজ সরকার সাংঘাতিক একদল সশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়ে ছ'মাসেই ডাকাতদের শেষ করে দেয়। যে ক'জন ডাকাত প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল তারা ক্যানিং সোনারপুর বারুইপুর হরিণাভিতে পালিয়ে চাষবাস করে জীবন কাটাতে লাগল। অল্প যে ক'জন পালাবার সময় লুটের টাকাকড়ি গয়নাগাঁটি সঙ্গে আনতে পেরেছিল, তাদের কেউ কেউ পরে অনেক জায়গা-জমি কিনে ছোটখাটো জমিদার হয়ে গিয়েছিল।

বিশুর জ্যাঠামশাই বারুইপুরে পালিয়ে আসা সেইরকম এক ডাকাতের বংশধর।

আমি যে বছর ক্লাস ফাইভে উঠলাম, সেবছর গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার প্রথম বিশুর জ্যাঠামশাইয়ের শ্বশুরবাড়ি যাবার কথা হয়েছিল।

তারপর ক্লাস সিক্স, সেভেনের পর এইটের পরীক্ষাও হয়ে গেল, ‘মুড়োহাসা’ গ্রামে আমার আর যাওয়াই হল না।

এর মধ্যে বিশুও আর জ্যাঠামশাইয়ের শ্বশুরবাড়ির গ্রামে যায়নি। তার কারণ তার জ্যাঠামশাই নিজের যাত্রাদল ধরে রাখতে না পেরে দূর দূর গ্রামের যাত্রাদলে পার্ট করতে যান। সেখানকার যাত্রাদলের অধিকারীরা অনেকেই চন্দ্রকান্ত অধিকারীর অভিনয়গুণের কথা ভালোমতোই জানে। চন্দ্রকান্তকে পেয়ে তাদের হাতে চাঁদ পাবার দশা। দিনে দিনে অন্যান্য দলের অধিকারীও চন্দ্রকান্তকে নিজের নিজের দলে টানতে চায়।

বিশুর জ্যাঠামশাইয়ের তাই নিজের বাড়িতে রোজ আর ফেরা হয় না। ফিরলেও দূর গ্রামে যাত্রাপালা শেষ করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভোর হয়ে যায়। কখন তিনি বাড়ি থাকেন, কখন বেরিয়ে যান, কখন ফেরেন তার কোনও ঠিক নেই। দিনের পর

দিন, কখনও মাসের পর মাস বিশুর সঙ্গে তাঁর আর দেখাই হয় না।

ঠিক হল ক্লাস নাইনের পরীক্ষা শেষ হলেই আমি আর বিশু ওর জ্যাঠামশাইয়ের শ্বশুরবাড়ির গ্রামে বেড়াতে যাব। বিশু এর আগে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে অনেকবার গেছে, ফলে শুধু নদীর পথই না, মাঠ-খেতের রাস্তাও তার চেনা।

এর মধ্যে একটা মজার ঘটনা ঘটল। কালীপুজোর দিন অনেক দিন পর বিশুর জ্যাঠামশাই হ্যারিকেনের আলোয় তিন গাছের ছায়া দোলাতে দোলাতে উত্তরের রাস্তায় না গিয়ে হঠাৎ আমাদের আঁকাবাঁকা রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর আমাদের বাড়ির সামনে এসে যে জানলা দিয়ে আমি রাস্তার দিকে চেয়ে থাকি, সেই জানলার গরাদে সাত ফুট লম্বা দেহ কুঁজো করে মাথা অনেকটা ঝুঁকিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো মুখ ভরতি করে হাসলেন। সেই হাসিমাখা চোখে আমার চোখে তাকিয়ে বললেন, 'এবার কিন্তু আমার শ্বশুরবাড়ির গ্রাম মুড়োহাসা ঠিক যেও।' বলেই গাছের ওপর আলো ফেলতে ফেলতে আমাদের আঁকাবাঁকা রাস্তার মুখ পর্যন্ত গিয়ে, তারপর রাস্তার ওপর গাছের ছায়া দোলাতে দোলাতে উত্তরের পথে চলে গেলেন।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি শেষ পেপারের পরীক্ষা দিয়ে পরদিন আমরা দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়লাম। বারুইপুর থেকে ট্রেনে সোনারপুর, সেখানে ট্রেন বদলে ক্যানিং লোকালে চড়ে ক্যানিং, স্টেশন থেকে গলিঘুঁজি মাছের বাজার পেরিয়ে জুতো হাতে নিয়ে নদীতীরের জলকাদা মাড়িয়ে খুব সাবধানে একটা ভটভটিতে উঠে বসলাম। ভটভটিতে যত লোক বসতে-দাঁড়াতে পারে, লোক উঠেছে তার অনেক বেশি। পাশ দিয়ে বড় লঞ্চ চলে গেলে তার ঢেউয়ের ঝাপটায় ভটভটি খুব দুলতে থাকে, মনে হয় উলটে যাবে না তো? তার ওপর এ হল স্বয়ং মাতলা! মাতলা নদীতে সামান্য ঝড় উঠলেই এরকম মোটর লাগানো বড় সাইজের নৌকো উলটোবার খবর প্রায়ই শোনা যায়।

বড় লঞ্চের ঢেউয়ের ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে পাইলট বেশ কসরত করে ভটভটিকে ঠিকমতো চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লুঙ্গি-গেঞ্জি পরা গ্রামের পাইলটের আরও একটা বাহাদুরি দেখলাম— এত বড় নদীতে পাড়ের কোথাও মানুষের ঘরবাড়ির কোনও চিহ্ন নেই, বটগাছ তেঁতুলগাছ শিরীষগাছ কলাগাছ ডাবগাছ— কোনও গাছ দিয়েও কোনও গ্রাম চেনবার উপায় নেই, তা সত্ত্বেও একটু পর পর শুধু দূর থেকে পাড়ে একদল ছেলেবুড়ো, বউ-মেয়ে, বাচ্চা কোলে-মা আঁকা-ছবির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে পাড়ের যতটা সম্ভব কাছে ভটভটি নিয়ে যায়। যাত্রীরা অনেকে জলে-কাদায় নেমে যায়। পাড়ের মানুষ অনেকে জল-কাদা ভেঙে ভটভটিতে ওঠে।

এরকম সাতবারের বার ভটভটি পাড়ের কাছাকাছি আসতে 'মুড়োহাসা এসে গেলাম' বলে বিশু হাত ধরে আমাকে নামিয়ে আনল।

তারপর মাঠের পর মাঠ পার হয়ে, ধানখেতের আল বেয়ে দিনের শেষে এসে পৌঁছলাম বিশুর জ্যাঠামশাইয়ের শ্বশুরবাড়ি। গরাণপাতায় ছাওয়া, এঁটেল মাটির দোতলা বাড়ি।

বিশুকে দেখে, বিশুর স্কুলের বন্ধুকে দেখে বাড়িসুদ্দু সকলেই বেশ খুশি মনে হল। আমাদের বয়সি তিনটে ছেলে। প্রথমে একটু লাজুকভাবে দূরে দূরে থাকলেও ছোট

ছেলেমেয়েরা আমাদের হাত ধরে টানাটানি লাগিয়ে দিল।

খুব বুড়িমতন একজন হাতের ইশারায় চারজন জোয়ান লোককে কাছে ডেকে বলল, 'চন্নর গাঁয়ের কুটুম্ব এয়েছে, তিন পুকুর চষে বড় দেখে দু'খানা মাগুরমাছ নে আয় বাবা।'

আমাদের মায়ের বয়সি বউরাও আমাদের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসার সময় তিনহাত ঘোমটা টেনে কেন যাচ্ছে কে জানে! বিশু বলে দিল, এটাই নাকি এ গাঁয়ের নিয়ম। ডাকাতদের আমলে যখন বণিক, ব্যবসাদার, জমিদার বা তাদের ছেলেদের ধরে এনে এই গ্রামে হাত-পা-মুখ বেঁধে বন্দি করে রেখে তাদের বাড়ি থেকে মোটা টাকা পণ আদায় করার চল ছিল তখন বন্দিদের সামনে দিয়ে যাতায়াতের সময় গ্রামের মেয়ে-বউদের হাঁটু অব্দি ঘোমটায় ঢেকে থাকতে হত। ডাকাতরা আর নেই, কিন্তু গ্রামের সেই নিয়ম আজও রয়ে গেছে।

সন্ধের মুখে এ বাড়িতে আসামাত্র বাটিভরা ঘন মধু দিয়ে মুড়ি খেতে হয়েছে। এখন সবাই মিলে আমাদের রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা বন্দোবস্তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কেউ মাটির দাওয়ায় আট-দশজনের মতো গরাণপাতার চাটাই পাতছে, কেউ কেউ বড় বড় পদ্মপাতা সাজিয়ে রাখছে, কেউ তার পাশে ভারী ভারী কাঁসার গেলাসে জল ঢেলে দিচ্ছে— এ যেন গাঁয়ের নেমন্তন্ন বাড়ি।

সবাই যখন আমাদের খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে মেতে আছে, বিশু আমার কাছে এসে বলল, 'চল, তোকে নিয়ে গ্রামটা একটু ঘুরে আসি। একটু দূরে একটা জায়গা আছে, যেখানে তিন নদী পরস্পরের সঙ্গে মিশেছে। খুব হাওয়া সেখানে। ঝড়ের মতো হাওয়া তোর ভালো লাগে না?'

'খুব জোরে হাওয়া বইলে আমার খুব ভালো লাগে। মনে হয় যেন দূরে কোথাও উড়িয়ে নিয়ে যাবে!'

অচেনা গ্রামে রাতের আঁধারে কোথায় কোন তিন নদীর কোলে ঝড়ের মতো হাওয়া গায়ে লাগবে ভেবে আমার ভারি ভালো লাগছে, মনে মনে রীতিমতো রোমাঞ্চ হচ্ছে। একটাই অসুবিধে, অন্ধকারে মাঝেমাঝেই শক্ত মাটির ঢেলায় হোঁচট খাচ্ছি।

দূরে মনে হল একটা তারা খসল। ঠিক মাটিতে পড়ল না, মাটির কিছুটা ওপরে ভেসে রইল, এক জায়গায় ভেসেও নেই, সামনে পিছনে তারাটা দুলছে। আরও আশ্চর্যের কথা, দুলতে দুলতে তারাটা ক্রমশ এদিকেই এগিয়ে আসছে।

আমি বিশুর হাত খামচে ধরে বললাম, 'তোর জ্যাঠমশাইয়ের হ্যারিকেন নয় তো!'

কালীপুজোয় আমার জানলায় এসে বিশুর জ্যাঠামশাইয়ের নেমন্তন্ন করার কথা বিশুকে বলা হয়নি, এখন মনে পড়তেই সেদিনের কথাটা বললাম।

বিশু মন দিয়ে আমার কথাটা শুনল কিনা বুঝলাম না, সে আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'জ্যাঠামশাই! আপনি এসে গেছেন?'

এতদূর থেকে যতই চেঁচাক, বিশুর জ্যাঠামশাই নিশ্চয় শুনতে পাননি। আলোর দিক থেকে কোনও সাড়া এল না। বিশু কিন্তু আনন্দে আমার হাত ধরে প্রায় টানতে

টানতে আলোর দিকে এগিয়ে চলল।

আমার সন্দেহ, বিশুর অনুমান পুরোটাই সত্যি! বিশুর জ্যাঠামশাই আমাদের একেবারে কাছে এসে কালীপুজোর দিনের মতো মুখভরা হাসি নিয়ে বললেন, 'তোমরা এসেছ দেখে আমার ভালো লাগছে। ওকেও শেষ অব্দি নিয়ে এসেছ, এবার সবাই খুশি!'

আমি বললাম, 'জ্যাঠামশাইকে দিয়ে আমাদের স্কুলের সেন্টিনারি উৎসবে যাত্রা করালে কেমন হয়?'

বিশু আমার কথায় কান না দিয়ে জ্যাঠামশাইকে বলল, 'উঃ, কত দিন পর তোমার দেখা পেলাম জ্যাঠামশাই! চলো, সেই অনেক আগের মতো আজ একসঙ্গে বসে খাব। বড় বড় মাগুরমাছ ধরেছে।'

'আমি শুধু তোদের একটু দেখতে এসেছি রে! আজ তো তোর সঙ্গে যেতে পারব না। আজ গোসাবায় আমার বড় যাত্রাপালা। এখনই যেতে হবে। ওই তো সুন্দরীগাছে আমার নৌকো বাঁধা।'

সুন্দরীগাছে নৌকো বাঁধা! সুন্দরী কাণ্ড তো দুর্বল, তাতে নৌকো বেঁধেছেন! অবশ্য এসব বিষয়ে আমি আর কতটুকু জানি!

তিন নদীর কূল কি কাছেই? হঠাৎ খুব জোরে হাওয়া দিতে লাগল। সঙ্গে অদ্ভুত একটা শব্দলহরী যেন হাওয়ার সঙ্গেই ভেসে আসছে।

'কী ব্যাপার বিশু? শব্দটা কীসের মনে হয় তোর?'

'আরে ও তো ম্যানগ্রোভের আওয়াজ! শ্বাসমূলের জঙ্গল থেকে জোয়ারের জল নেমে যাচ্ছে, হাওয়ায় তার শব্দ ভেসে আসছে। ওই শব্দকেই তো আগেকার দিনে এ গ্রামের মানুষ মাছের মুড়োর হাসি ভেবে ভয় পেত। ডাকাতরা মাছের মুণ্ডু কেটে ফেলে দিত, তুই জানিস না? গ্রামের নামও তো তাই থেকে।'

আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। যেদিক থেকে এসেছি, সেদিক থেকে অনেকগুলো হ্যাজাকের আলো, জ্বলন্ত মশাল নিয়ে অনেকগুলো লোক এদিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে দেখা গেল তারা বিশুর জ্যাঠামশাইয়ের শ্বশুরবাড়ির লোক, আমাদের না দেখে ভয় পেয়ে আমাদের খোঁজে বেরিয়েছে। এদিকে নাকি আজকাল প্রায়ই বাঘ বেরোয়। তাছাড়া রান্না তো সব ঠান্ডা হতে বসেছে।

বিশু সেসব কথায় কান না দিয়ে বিষণ্ণ গলায় নিজের মনে বলল, 'জ্যাঠামশাইকে এত করে বললাম আজ তোমার সঙ্গে খাব, তুমি চলো। তাঁর কাছে তাঁর যাত্রাপালাই বড় হল!'

'কী বলছ কী? তোমার জ্যাঠামশাই কোত্থেকে আসবেন? তিনি তো গত বৈশাখে গোসাবায় যাত্রা করতে যাবার পথে নৌকোডুবি হয়ে মারা গেছেন!'

'সে কী! আমাদের খবর দাওনি তো?'

জ্যাঠাইমার ছোট ভাই বলল, 'খবর কাকে দেব? তোমার অন্ধ- কালা ঠাকুদ্দাকে? জার্মানিতে তোমার বাবাকে? তিনি কি মেমসাহেব বউ নিয়ে ছুটে আসতেন? খবর দেবার ছিল তোমার জ্যাঠাইমাকে। তিনিই তো তিনদিন পর নিজেদের ঘাটে ভেসে ওঠা দেহ প্রথম দেখে চিনলেন! তোমাদের বারুইপুরের জঙ্গলে পোড়ো বাড়িতে তিনি

যদি ফিরে যেতেন তাহলে না-হয় ও বাড়িতে একটা খবর পৌঁছত! তুমি ছেলেমানুষ, জ্যাঠামশাইকে ভালোবাসতে, জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে এ বাড়িতে অনেকবার এসেছ, তোমাকে কেউ আর দুঃখ দিতে চায়নি।'

বিশু সব শুনেও জ্যাঠামশাই আর নেই বিশ্বাস করতে পারছে না। অবাক গলায় শুধু বলল, 'আমি যে নিজের চোখে দেখলাম। আমার সঙ্গে জ্যাঠামশাই তো কথাও বললেন। বলেননি, অমু?'

এবার জ্যাঠামশাইয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেদের একজন ব্যস্ত হয়ে বলল, 'চলো, চলো। বাড়িতে সবাই অপেক্ষা করছে! আর ওনার খুত্থুরে বুড়ি শাশুড়ি নিজের হাতে তোমাদের জন্য আস্ত আস্ত দুটো মাগুরমাছ রেঁধে থালা সাজিয়ে বসে আছেন! আস্ত মাগুর ওনার জামাই বড্ড ভালোবাসতেন গো!'

মাগুরমাছ আমাদের দু'জনের কারওই খেতে ইচ্ছে হল না। জ্যাঠাইমার অনুরোধে আমি একটুকরো মুখে দিলাম বটে, গিলতে পারলাম না। বিশু তো মুখেই দিল না।

রাতে সবাই যখন ঘুমোচ্ছে, বিশু চুপিচুপি আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'চল, গোসাবা যাই। যদি দেখি জ্যাঠামশাই যাত্রায় পার্ট করছেন তাহলে জানব বাড়ির সবাই আমাদের মিথ্যে বলছে।'

'মিথ্যে বলবে কেন? ওদের লাভ কী?'

'এ গ্রামের মানুষের কার মনে কী আছে কে বলতে পারে! হয়তো জ্যাঠামশাই মারা গেলে তাঁর কোনও লুকনো ধন-সম্পত্তি এরা দখল করবে! ভুলে যাস না জ্যাঠামশাইয়ের পূর্ব-পুরুষরা ডাকাত ছিল। প্রচুর ধনসম্পদ লুট করেছে। পরে ইংরেজ পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাবার সময় কে কোথায় কী লুকিয়ে রেখে গেছে এরা হয়তো তার কোনও খোঁজখবর পেয়েছে। জ্যাঠামশাই বেঁচে থাকলে তাতে হাত দেওয়া হয়তো সম্ভব নয়। বিশেষ করে জ্যাঠামশাই অনেকদিন ধরে বৈষ্ণব, যাত্রাপালা নিয়ে থাকে।'

'এদিকটা আমার মনে আসেনি। এ তো বেশ জটিল ব্যাপার! চল তবে, গোসাবায় গিয়ে সত্যিমিথ্যে যাচাই করে আসি।'

দু'জনে সন্তর্পণে মশারির বাইরে এসে পা টিপে টিপে বন্ধ দরজার দিকে এগোচ্ছি, দরজা আপনা-আপনি খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে জ্যাঠামশাই, তার হাতে সেই হ্যারিকেনটা আর নেই। ঘাড় অনেকটা ঝুঁকিয়ে দরজার বাইরে থেকেই জ্যাঠামশাই বললেন, 'এত রাতে কোথায় যাচ্ছিলে? গোসাবায় তো? যেও না। আসার সময় দেখে এলাম নদীর অবস্থা আজ ভালো না। আমি যাই, যাত্রা ফেলে এসেছি!'

জ্যাঠামশাইকে অন্ধকারের মধ্যে চলে যেতে দেখে দু'জনেই আমরা গলা ছেড়ে অদ্ভুতভাবে চিৎকার করে উঠলাম।

ঘরের বন্ধ দরজায় একসঙ্গে অনেকগুলো হাতের ধাক্কায় আমাদের জ্ঞান ফিরল, না ঘুম ভাঙল জানি না। দরজায় ধাক্কা বেড়েই চলেছে, সকলেই জোরে জোরে আমাদের নাম ধরে ডাকছে। 'দরজা খোলো, শিগগির দরজা খোলো' বলে সবাই চেঁচাচ্ছে।

আমিই কোনওরকমে দরজা খুলে দিলাম। সবাই একসঙ্গে ঘরে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে

ঢুকে পড়ল।

সকলেরই এক প্রশ্ন— 'কী ব্যাপার? ডাকাত পড়ল, না ভূতে ধরেছে? চেঁচাচ্ছিলে কেন?'

যত না কৌতূহল, তার চেয়ে বেশি বিরক্ত। প্রশ্ন তো নয়, যেন ধমকাচ্ছে।

ওরা চলে যেতে দরজা বন্ধ করে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছি, এমন সময় আবার দরজায় শব্দ, এবার খুব আস্তে।

এবারও আমিই উঠে দরজা খুললাম। টাকমাথা এক বৃদ্ধ, তার সারা মুখে বড় বড় আঁচিল, ঠিক যেন ছোট ছোট অনেকগুলো গেঁড়ি সেঁটে বসে আছে, আমার কাঁধে হাত রেখে ঘরের ভিতরে এসে বললেন, 'আমি বিশুর জ্যাঠাইমার বড়দা।'

বিশুর চোখ বোজা ছিল, নিজের নাম শুনেই হয়তো, তড়াক করে বিছানায় লাফিয়ে উঠে বসে চোখ বড় করে চেয়ে রইল। জ্যাঠাইমার বড় দাদা, টাকমাথা বৃদ্ধ, কপাল-ভুরু বিশ্রীরকম কুঁচকে রেখে বললেন, 'চন্দ্রনাথ এসেছিল তো? মাঝে মাঝেই ওরকম আসে, পাছে আমরা কেউ ডাকাতের ধনে লোভ করি। সেটা ভেবে মরেও ওর শান্তি নেই।'

বিশু ফ্যাসফেসে গলায় জ্যাঠাইমার বড়দাকে জিজ্ঞেস করল, 'গোসাবা এখান থেকে কত দূর?'

'এই তো নদীর ওপারে।'

বিশু আশা ছাড়তে পারে না, বলল, 'কাল রাতে ওখানে যাত্রা হয়েছে কিনা জানা যায় না?'

'রোজই এখন গোসাবা বাজারে যাত্রা হয়। রাতে গেলে হঠাৎ হঠাৎ চন্নকে পার্ট করতেও দেখবে। যাত্রা তো ওর প্রাণ। মরেও ছাড়তে পারেনি।'

'আমরা গোসাবা যাব!' বলে যেই আমরা বেরোতে যাচ্ছি, আবার বাড়ির সবাই ছুটে এল। আমাদের দু'জনকে প্রায় ধাক্কা দিতে দিতে ঘরে ঢুকিয়ে এনে বলল, 'তোমরা বেরোতে যাচ্ছিলে? খবরদার এখন বাইরে যাবে না!'

জ্যাঠাইমার ছোট ভাই বলল, 'আবার কি কেউ তোমাদের ভয় দেখাতে এসেছিল? টাকমাথা, মুখ ভরা আঁচিল— এসেছিল কেউ?'

বিশু রাগ চাপতে না পেরেই উত্তর দিল, 'ভয় দেখাবেন কেন? উনিই তো জানালেন, আমার জ্যাঠামশাইকে এখনও গোসাবার বাজারে দেখা যায়।'

জ্যাঠাইমার ছোটভাই মুখ গম্ভীর করে বলল, 'আমার বড়দা। জামাইবাবুর আগের বছর মারা গেছে। দু'জনে খুব বন্ধু ছিল তো, এখনও তেমনই আছে মনে হয়।'

প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৫